আমাদের মুল্যবোধ কি ঈশ্বর হতে আগত?

(Do our values come from God?)

মুন্সী কেফায়েতুল্লাহ

(মুল: ভিক্টর জে. ষ্টিঙ্গার)

ন্যায়ের সংজ্ঞা কী (What is Right)ঃ

মানুষ কীভাবে আচার আচরণ করবে তা নির্ধারণের ভার তার নিজের হাতে নেই, সে ভার গ্রহন করেছে সমাজে প্রচলিত ধর্মগুলি, বিশেষ করে খৃষ্টান ধর্ম। ধর্মের মোড়লরা মনে করে যে সমাজের বাকী লোকগুলো কীভাবে চলবে ফিরবে, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়- তা বিচার করার অধিকার একমাত্র তাদের, কারণ তাদের মতে ন্যায়বোধের উৎপত্তিস্থল হলো ঈশ্বরের মন (Mind of God)। সেই স্বগীয় কেন্দ্রের সাথে কমিউনিকেট করার জন্যে একমাত্র তাদেরই রয়েছে ডাইরেক্ট পাইপলাইন। সমাজের অনেক সেকুলার বিজ্ঞানীকেও বিনা প্রতিবাদে এই দাবী মেনে নিতে দেখা যায়। ষ্টেম সেল রিসার্চ কিংবা মরণাপন্ন রোগীর উপর হতে লাইফ সাপোর্ট যন্ত্রপাতি প্রত্যাহার সংক্রান্ত নৈতিক ইস্যুগুলি যখনই রাজনীতির অঙ্গনকে গরম করে তুলে, তখন ধর্মযাজকদের ডেকে আনা হয় তাদের জ্ঞানগর্ভ মতামত শোনার জন্যে। অথচ এসব ক্ষেত্রে কখনই কোন নিরীশ্বরবাদী, মুক্তমনা কিংবা মানবতাবাদীর মতামত নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বরং সুযোগ পেলেই তাদেরকে তুলোধুনা করা হয়ে থাকে।

নৈতিকতা সম্পর্কে ধর্মের কাছে সমাজের এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের গোড়ায় রয়েছে একটি যুগসঞ্চিত ধারণা- মানুষ মনে করে যে 'পরম মঙ্গল' (absolute good) এই মাটির পৃথিবীর বিষয় নয়, এর অরিজিন হচ্ছে স্বর্গ। অথচ পরম মঙ্গল জিনিষটির স্বরুপ বুঝতে পারলে তবেই কেবল এর প্রকৃত অরিজিন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। মঙ্গালের সাথে স্বগীয় নির্দেশ গুলিয়ে ফেললে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তা যুক্তিশাস্ত্র বা লজিক লঙ্ঘন করে। প্লেটোর ডায়লগে ইউথিফ্রু নামক এক তরুন ঠিক এরুপ একটি সমস্যায় পড়েছিল। সমস্যাটি ইউথিফ্রুর পিতাকে নিয়ে। নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত পিতাকে স্বহস্তে বধ করতে হবে ইউথিফ্রুকে, এ হচ্ছে ঈশ্বর তথা ধর্মের নির্দেশ। অথচ তার বিবেক বলছে জন্মদাতা পিতাকে সাপোর্ট করতে। স্বগীয় নির্দেশ নাকি বিবেকের তাড়না- কোন পথ বেছে নেবে ইউথিফ্রু? অবশেষে ঈশ্বরের ইচ্ছেকে পুর্ণ করতে পিতাকে হত্যা করবে বলে মনস্থির করল সে, কারণ তাতেই নাকি নিহিত আছে কল্যান। সক্রেটিস তাকে বললেন- দেবতার নির্দেশ পালনের চেয়েও মহত্তর কোন মঙ্গাল (higher good) আছে বলে যদি তোমার বিবেক বলে, সেক্ষেত্রে দেবতার নির্দেশ পালন করতে যাওয়া অন্যায়।

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অহরহ এরুপ উভয় সঙ্কটের মুখোমুখী হতে হয়। কাজটি ভাল তাই কাজটি করতে ঈশ্বর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছেন তাই কাজটি ভাল? (Does God will us to do certain acts because they are good or is an act good because God wills it?)। (যদি এমন হয় যে কাজটি ভাল তাই ঈশ্বর কাজটি করতে তাগিদ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে ভাল আর ঈশ্বরনির্ভর থাকে না- ঈশ্বর বললেও কাজটি ভাল, না বললেও তাই)।

মনে করুন স্বয়ং ঈশ্বর আপনার সামনে আবির্ভুত হয়ে বললেন- তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করো, তাহলে আমি খুশী হবো (বাইবেল বর্ণিত আব্রাহাম ও ইসহাকের গল্পের অনুরুপ)। আপনি কি করবেন? আব্রাহামের মতো স্বীয় পুত্রকে বলি দিতে নিয়ে যাবেন, নাকি নিজ বিবেকের নির্দেশানুযায়ী আরও মহত্তর মঙ্গালের শরণ নিবেন (অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্দেশকে অবজ্ঞা করবেন)?

ধার্মিকেরা যুক্তি দেবেন - যা ভাল নয় ঈশ্বর কখনও তেমন কিছু করতে বলবেন না। এই যুক্তিতে কিন্তু ধার্মিকেরা স্বীকার করে নিলেন যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা ঈশ্বর নির্ধারণ করেন না, ভালোত্ব ঈশ্বরনির্ভর নয় (good exists independent of God)। যদি একমাত্র ঈশ্বরই ভালোত্ব নির্ধারণের মালিক হতেন, তাহলে তিনি বলতেই পারেন যে পুত্রকে হত্যা করা তেমন মন্দ কিছু নয়।

ওল্ড টেষ্টামেন্টের ঈশ্বর প্রায়শই তার নামে নৃশংসতা করতে তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছেন। বাইবেলে বর্ণিত এরুপ কিছু বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া হলো নিম্নে, – সানডে স্কুলের যাজকগণ কখনও এসব বাণী শ্রোতাদের সামনে মুখে আনেন না।
হযরত মুসা (আঃ) এক যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রচুর পরিমান যুদ্ধবন্দী করায়ত্ব করেছেন। ঈশ্বরের নির্দেশানুযায়ী সৈন্যরা ইতিপুর্বেই প্রতিটি পুরুষ বন্দীকে কতল করে ফেলেছে। বাদবাকী বন্দীদের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ কীরুপ– মুসার মুখ থেকে তা জেনে নিন–

"অতএব এখন শিশুবন্দীদের মধ্য থেকে প্রতিটি ছেলে শিশুকে মেরে ফেল। মেয়েদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই কোন পুরুষের শয্যাসংগিনী হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করো। তবে যে সব তরুনী এখনও পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়নি (কুমারি), তাদেরকে তোমাদের (ব্যবহারের) জন্যে জীবিত রাখ"। (নাম্বারস– ৩১: ১৭–১৮ আরএসভি)।

আরেকবার হযরত মুসা (আঃ) করুনাময় ঈশ্বরের নির্দেশানুযায়ী হাজার তিনেক আদমসন্তানকে হত্যা করেন।

এবং তিনি তাদেরকে বললেন– "ঈসরাইলের প্রভু ঈশ্বরের এরুপ ইচ্ছা–'প্রতিটি লোককে তার পার্শ্ব দিয়ে কেটে ফেল, এবং ক্যাম্পের দরজায় দরজায় হানা দিয়ে প্রতিটি লোককে তার সংগীসহ হত্যা করো, প্রতিটি লোককে তার প্রতিবেশীসহ হত্যা করো'"। (এক্সোডাস–৩২–২৭ আরএসভি)।

আমি নিশ্চিত – অধিকাংশ খৃষ্টান পবিত্র গ্রন্থের উপরের বাণীগুলিকে নৈরাজ্যকর ঘটনা বলে উড়িয়ে দেবেন এবং বলবেন যে যীশুখৃষ্টের আগমনের পর উক্ত অবস্থার অবসান হয়েছে। তবে মুশকিল হয়েছে– নিউ টেষ্টামেন্টের অনেক জায়গায় দয়াল যীশু তার পুর্ববতী নবীদের নিয়মকানুন সম্পুর্ণ বৈধ হিসেবে বহাল রেখেছেন।

'ভেবো না যে আমি (পুর্ববর্তী) আইনসমুহ কিংবা নবীদের বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলি বাতিল করতে আসিনি, বরং পরিপুর্ণ করতে এসেছি' (ম্যাথিও–৫: ১৭, আরএসভি)।

খৃষ্টানরা তাদের পারিবারিক মুল্যবোধ নিয়ে গর্ব করে থাকে, ভূপৃষ্ঠকে শান্তির বাতাবরণে ঢেকে দেয়াই তাদের মিশন বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কোন সন্দেহ নেই যে এসব লোকদের অধিকাংশই নিজ নিজ পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং যে সমাজে তারা বাস করে সেই সমাজের নিষ্ঠাবান সদস্য। কিন্তু তারা ভুলে যান যে যীশুখৃষ্ট বলে গেছেনঃ

'ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে এসেছি। আমি পৃথিবীতে শান্তি প্রেরণ করতে আসিনি, বরং তরবারী প্রেরণ করতে এসেছি। কারণ, আমি এসেছি যেন পুত্র তার পিতার বিরুধ্বাচারণ করে, কন্যা মায়ের বিরুধ্বাচরণ করে, এবং পুত্রবধু শ্বাশুরির বিরুধ্বাচারণ করে, এবং মানুষের শত্রু হয় তার নিজেরই পরিবারভুক্ত সদস্যগণ। যে ব্যাক্তি আমার চেয়ে তার নিজের বাপমাকে বেশী ভালবাসে, সে আমার দলভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়; এবং যে ব্যাক্তি আমার চেয়ে তার নিজের পুত্রকন্যাদেরকে বেশী ভালবাসে সে আমার দলভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়' (ম্যাথিও–১০:৩৪–৩৭ আরএসভি)।

তা'হলে কোত্থেকে এই ধারণার উৎপত্তি হলো যে যীশু ছিলেন 'প্রিন্স অব পিস' – শান্তির রাজকুমার?

এই শান্তির রাজকুমার যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন, সেই খৃষ্টধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? আমরা দেখতে পাই চার্চ কতৃক অনুমোদিত এবং স্বর্গকতৃক প্রণোদিত একগুচ্ছ মঙ্গাল (divinely inspired good)-; প্রকৃতপ্রস্তাবে যা ভায়োলেন্স ও সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এই স্বগীয় অনুপ্রেরণা শুধু যে শাস্ত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, যুগে যুগে তা বিশেষ বিশেষ মনোনীত জনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পোপ ২য় আর্বান (১০৯৯ খ্রীঃ) ক্রুসেডের সময় মধ্যযুগীয় নাইটদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে কাফের (infidels) হত্যায় কোন পাপ নেই। এই কাফের বলতে শুধু যে পবিত্র ভুমিতে বসবাসরত মুসলমানদের বুঝায় তা নয়, সমস্ত অখৃষ্টান জনগোষ্ঠি এই কাফের শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। ক্যাথার ধর্মাবলম্বী একটি সম্প্রদায় দক্ষিন ফ্রান্সে বসবাস করতো। দুই ঈশ্বরে বিশ্বাসী এই ধর্ম মুলতঃ প্রাচীন জরুথ্রুষ্টীয় ধর্মের অনুরুপ। ত্রয়োদশ শতকের আলবিনো ক্রুসেডের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়কে সমুলে ধ্বংস করা হয়। ১২০৯ খৃষ্টাব্দে বেজিয়া'র ক্যাথার নগরীর পতন ঘটে এবং বিপুল পরিমানে যুদ্ধবন্দী ক্রুসেডারদের করতলগত হয়। এই বন্দীদের মধ্যে কে বিশ্বাসী আর কে কাফের তা নির্ধারণ করতে সৈন্যরা মহামান্য পোপের উপদেশ চায়। তিনি বিধান দেন- "সব্বাইকে হত্যা করো। কে নিজের লোক ঈশ্বরই তা বেছে নেবেন"। প্রায় হাজার বিশেক বন্দীকে হত্যা করা হয়, অনেকের চোখ উপড়িয়ে ফেলা হয়, অনেকের দেহ ঘোড়ার পায়ে বেঁধে ঘোড়া চালিয়ে দলিতমথিত করা হয়, কাউকে বা টার্গেট প্র্যাক্টিসের শিকার বানানো হয়।

পুর্ববর্ণিত ইউথিফ্রু সঙ্কট সমাধানে যদি আমরা মেনে নিই যে ঈশ্বর যা বলেন তাই মঙ্গালজনক এবং ঈশ্বরের বাণী ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এবং অন্যান্য পবিত্র উৎস্যগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে, সেক্ষেত্রে প্রতিটি শত্রু সৈন্য এবং সিভিলিয়ানকে হত্যা করা ইহুদী এবং খৃষ্টান ক্রুসেডারদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল, ব্যতিক্রম শুধুমাত্র অক্ষতযোনী কুমারিবৃন্দ। ভোগের জন্যে এসব কুমারিদের বাঁচিয়ে রাখাও ক্রুসেডারদের নৈতিক দায়িত্ব।

ঐশ্বরিক মঙ্গালের পরিধি শুধুমাত্র এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়! নৈতিক গাইড হিসেবে বাইবেলকে মেনে নিলে ইহুদি-খৃষ্টানদের আরও অনেক অবশ্য-করণীয় কাজ আছে। যেমন- যদি তাদের পরিবারের কোন সদস্য অন্য কোন ধর্ম গ্রহন করার চেষ্টা করে (ইসলামী পরিভাষায় যার নাম মুরতাদ), তাকে মেরে ফেলা অবশ্য করণীয় হয়ে দাড়ায়।

'যদি তোমার ভাই, তোমার মায়ের ছেলে, অথবা তোমার পুত্র, অথবা তোমার কন্যা, অথবা তোমার প্রিয় বন্ধুর স্ত্রী, অথবা তোমার বন্ধু যে তোমার নিজ প্রাণের মতোই প্রিয়, যদি তোমাকে এই বলে মন্ত্রণা দেয় যে- চলো আমরা অন্য দেবতার পুজো করি, যে দেবতাকে তুমি কিংবা তোমার পিতৃপুরুষরা কেউ জানে না, কিছু দেবতা যাদেরকে তোমার পার্শ্ববর্তী জাতিসমুহ পুজো করে, তোমার নিকটবর্তী কিংবা দুরবর্তী, পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত,- তুমি কিছুতেই তার অনুগত হবে না এবং তার কথা শুনবে না, তোমার চোখে তার জন্যে কোন দয়ামায়া থাকবে না, তুমি তাকে ছেড়ে দেবে না, তুমি তাকে লুকিয়ে রাখবে না-, কিন্তু তুমি অবশ্যই তাকে হত্যা করবে, তাকে হত্যা করতে তোমার হাতই সর্বাগ্রে প্রসারিত হবে, অতঃপর প্রসারিত হবে আর সকলের হাত। তুমি অবশ্যই তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে, কারণ সে তোমাকে তোমার প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল, যিনি তোমাদেরকে মিশরভুমি হতে বের করে এনেছিলেন, তোমাদেরকে দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত করেছিলেন'। (ডিউটরনমি ১৩:৬-১১ আরএসভি)।

এবং তারা সপ্তাহের শেষ দিনে (সাবাথ ডে, আরবী-ইয়াওমুছ্ ছাবত) কর্মরত যে কোন লোককে হত্যা করতে নৈতিকভাবে বাধ্য।

‘সপ্তাহের ছয় দিন কাজের জন্যে বরাদ্দ রাখবে, কিন্তু সপ্তম দিনটি হবে সাবাথ ডে –সম্পুর্ণ বিশ্রামের দিন। সমস্ত পবিত্রতা শুধুমাত্র প্রভুর জন্যে, সপ্তম দিনে যদি কাউকে কাজ করতে দেখা যায় তবে তাকে অতি অবশ্য হত্যা করে ফেলতে হবে’ (এক্সোডাস–৩১:১৫ আরএসভি)।

কী মারাত্মক, একবার ভাবুন তো পাঠক! আমেরিকায় রবিবারদিন যে সব সুপার মার্কেট ও গ্যাস ষ্টেশন খোলা থাকে, ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানরা প্রভুর নির্দেশ পালন করতে স্বয়ংক্রিয় মারনাস্ত্র দিয়ে সেখানে কর্মরত সব লোককে মেরে ফেলল! এমন স্বগীয় মঙ্গালের (ডিভাইন গুড) কথা ভাবা যায়!
কোন কোন ধর্মতত্ববিদ যুক্তি দেখান, ঈশ্বরের এই সব ভয়ঙ্কর কার্য্যকলাপের পেছনে সুগুপ্ত রহস্যময় কারণ আছে যা আমাদের মতো নশ্বর জীবের প্রক্ষে হৃদয়ঙ্গাম করা অসম্ভব। এখন প্রশ্ন– আমাদের বিবেক সায় না দিলেও কি তা’হলে ঐসব ঐশ্বরিক নির্দেশ পালন করতেই হবে? যদি স্বয়ং ঈশ্বরও স্বর্গ হতে আমার সামনে হাজির হন এবং আমার ছেলেকে হত্যা না করলে আমি অভিশপ্ত হবো বলে ভয় দেখান, তবু আমি সে জঘন্য কাজ করবো না। পৃথিবীর অধিকাংশ বাপমা’ই আমার মতো আচরণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সঙ্গাতভাবেই অধিকাংশ ইহুদি এবং খৃষ্টান এসব ঐশ্বরিক নির্দেশকে জাষ্ট কাগুজে বিষয় বলে পাশ কাটিয়ে যান। এতে করে তারা কিন্তু ইউথিফ্রু সঙ্কটের গ্যাঁড়াকলে ফেসে যাচ্ছেন। ঈশ্বরের নির্দেশকে যদি ভালো বলে মেনে নেয়া না যায়, তবে ভালোর সংজ্ঞা কী?

বাইবেলের মতো কোরাণও কম রক্তপিপাসু নয়। অবিশ্বাসী বা কাফেরদের ভাগ্যে কী ভয়ঙ্কর পরিনতি অপেক্ষা করে আছে সে সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে কোরাণে। তবে শাস্তির ভার আল্লাহ–তায়ালা সাধারণতঃ নিজের হাতে রিজার্ভ রেখেছেন, বান্দার হাতে সোপর্দ করেননি।

‘নিশ্চয়ই, যারা আমার নির্দেশসমুহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করবো; যখন তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তৎপরিবর্তে আমি তাদের চর্ম পরিবর্তিত করে দেবো যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়’। (কোরাণ–৪:৫৬, অনুবাদ–প্রফেসর ডঃ মুজিবুর রহমান)।

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদেরকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে হবে, অবশ্য অনুতাপের একটা সুযোগ রয়েছে ইসলামে।

‘যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে, আর ভুপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ানো হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ হতে তাড়িয়ে দেয়া হবে; এটা তো ইহলোকে তাদের জন্যে ভীষণ অপমান, আর পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি। কিন্তু হ্যা, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার আগে যারা তওবা করে নেয়, তবে জেনে রাখ যে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু’। (কোরাণ–৫:৩৩–৩৪, অনুবাদ–প্রফেসর ডঃ মুজিবুর রহমান)।

একথা সত্য, প্রতিটি ধর্মেই কিছুসংখ্যক ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত প্রতিটি নির্দেশকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে মান্য করে থাকে এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করার চেষ্টা করে।

- ১৯৯৫ সালে ইগাল আমির নামক এক ব্যক্তি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিনকে হত্যা করে। সে ছিল খুবই ধর্মপ্রাণ ইহুদি, কোর্টে দাড়িয়ে সে বলেছিল– “আমি যা কিছু করেছি, ঈশ্বরের জন্যে করেছি”।

- ফ্লোরিডা রাজ্যে গর্ভপাত বৈধ করার কারিগর ডঃ জন ব্রিটন ১৯৯৪ সালে পল হিলের হাতে নিহত হন। ২০০৩ সালে যখন হিলের প্রাণদন্ডাদেশ কর্য্যকর করা হয় তার আগ মুহূর্তে হিলের উক্তি- "আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি যে তারা সম্ভবতঃ আমার কাজের জন্যে আমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাসে আমি খুবই সৎ, আমার আনুগত্যের জন্যে স্বর্গে অবশ্যই আমার জন্যে বিরাট পুরস্কার রয়েছে"।
- ১৯৯৮ সালে ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখ ওসামা বিন লাদেন ঘোষণা করে- "আমরা- আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিটি মুসলমানকে আহ্বান জানাই- যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং তার নির্দেশ পালন করে পুরস্কৃত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে- সে যেন আমেরিকানদের হত্যা করে এবং যখন যেখানে সুযোগ পায় আমেরিকান সম্পদ লুন্ঠন করে"।
- (বছর কয়েক আগে কিশোরগঞ্জের এক গ্রামে একটি ঘটনা দারুন আলোড়ন তুলেছিল। জনৈক মৌলানা সাহেব ঈদের নামাজ শেষে স্বহস্তে নিজ শিশু সন্তানকে কোরবানি দেন। পুলিশের জেরার জবাবে তিনি বলেছিলেন- হযরত ইবরাহিমের মতো তিনিও নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন এবং নামাজ শেষ করে ঘরে ফিরে আল্লাহু আকবর বলে স্বহস্তে ঘুমন্ত শিশুর গলায় ছুরি চালান। মারহাবা, মারহাবা। সংবাদটি তখন সবগুলি সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে মৌলানা সাবের এত বড় ত্যাগ না আল্লাহপাকের দরবারে না সমাজের অঙ্গানে তেমন স্বীকৃতি পেয়েছিল। হুজুর চোখ খুলে দেখতে পান- স্বগীয় দুম্বা নিয়ে কোন ফেরেশতা স্বর্গ হতে নেমে আসেনি এবং তার ছেলের গলাটি সত্যি সত্যি দু'ফাক হয়ে গেছে ! বেরসিক ডাক্তাররা তাকে পায়গম্বরের সমগোত্রীয় বলে স্বীকার না করে সিজোফ্রেনিয়ার রোগী বলে শনাক্ত করেছিল। এক যাত্রায় পৃথক ফল, বড়োই আফশোষ)।

সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রদায়গুলোতে এরূপ ধর্মোন্মাদের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। এর কারণ হয়তো এই যে ধর্মশাস্ত্রের ঠিক কোন জায়গাটিতে এসব ভয়ঙ্কর কর্মকান্ডের কথা লেখা আছে তা খুজে বের করা এবং তার মর্মোদ্ধার করা সাধারণের জন্যে ভীষণ কষ্টকর বৈকি।

কোনটা মঙ্গাল- একজন ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি কীভাবে তা নির্ধারণ করবেন তা'হলে? এমন দাবী নিশ্চয়ই কেউ করবেন না যে - কাজটি যে ভালো তা তারা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ থেকে শুনেছেন। তারা বড়জোর একথা বলতে পারেন - কোন রাব্বি, কোন পাদ্রী কিংবা কোন ইমাম বলেছে কথাগুলো। ঈশ্বরের এসব কাউন্সিলরবৃন্দ সাধারনতঃ ধর্মশাস্ত্র ঘেটে কিংবা নিজ ধর্মের মহাপুরুষ বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের শিক্ষার উপর নির্ভর করে ভালোমন্দের বিধান দিয়ে থাকেন। তবে সব সময় শুধু শাস্ত্রের উপর নির্ভর করলে চলে না, বিশেষ বিশেষ সময়ে আশু করণীয় সম্পর্কে বিধান দিতে নিজের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বা 'ইনার লাইটে'র শরণও নিতে হয় এসব হলি পুরুষদের। পরবতীতে আমরা দেখতে পাব - এই ইনার লাইট ঈশ্বর হতে আগত এরূপ দাবী সম্পুর্ণ ভুল।

মহৎ আদর্শ (**Noble Ideals**)

একথা অনস্বীকার্য্য যে জুডিও-খৃষ্টান এবং ইসলাম ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এমন বহু বিষয় রয়েছে যা মানব সমাজকে মহৎ আদর্শ শিক্ষা দেয়, অনেক সমাজ সেগুলিকে বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে গ্রহন করেছে। তবে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এসব মহৎ আদর্শগুলি অন্যান্য সমাজেও সমানভাবে বিদ্যমান থাকায় প্রমান হয় যে সভ্যতা সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারায় বহু যুগের চর্চা হিসেবে এসব নীতিসমুহ ক্রমান্বয়ে সমাজদেহে জন্মলাভ করেছে, কোন ঐশ্বরিক ধর্ম স্বর্গ হতে সেগুলিকে আনয়ন করেনি। সমাজে প্রচলিত এসব মহৎ আদর্শের উপর কোন বিশেষ ব্রান্ডের ঈশ্বরেরই কেবল একচেটিয়া দাবী রয়েছে- এমত মনে করার কোন কারণ নেই।

যে প্রাইমারী নিয়মটিকে অনুসরণ করে একজন লোক মোটামোটি নৈতিক ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে সেটি হচ্ছে "গোল্ডেন রুল"ঃ

"Do unto them as you would have them do unto you"-- অর্থাৎ "অপরের প্রতি সেই আচরণটিই করো যা তুমি নিজের প্রতি করতে পারতে। উল্টোভাবে বলা যায়- তুমি তোমার নিজের প্রতি যা পছন্দ করো না, অপরের প্রতি তা করতে যেয়ো না ।
(অত্যন্ত শাদামাটা একটি বক্তব্য, কিন্তু ব্যঞ্জনা কতোই না গভীর। আমি যেহেতু নিজে কারও দাস হতে পছন্দ করবো না, সুতরাং আমি কারও প্রভু হবো না; আমি যেহেতু নিজের স্ত্রীর সাথে অন্যের ব্যভিচার সহ্য করবো না, সুতরাং আমি অন্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করবো না; আমি যেহেতু চাইবো না যে কেউ আমাকে খুন করুক, সুতরাং আমি অন্যকে খুন করবো না.. ইত্যাদি ইত্যাদি।)

পশ্চিমের খৃষ্টান অধ্যুষিত সমাজে অধিকাংশ লোকের ধারণা- এটি যীশুখৃষ্টের শিক্ষা, মাউন্টের ভাষণের দিন যীশু এই বাণী বিলিয়েছিলেন। ধর্মপ্রচারকেরা ভালোভাবেই জানেন যে ধারণাটি সঠিক নয়, তবুও তারা বিশেষ কোন কারণে এই মিথ্যা ধারণা জিইয়ে রাখতে চান। স্বয়ং যীশু কখনও এরুপ দাবী করেননি। তিনি সেদিন যা বলেছিলেন, সুসমাচারের বর্ণনা অনুযায়ী তা নিম্নরূপ-!
"So, whatever you wish that men would do to you, do so to them; for this is the law of the prophets". (Mathew 7:12)।
"সুতরাং, লোকেরা তোমার প্রতি যেরুপ আচরণ করবে বলে তুমি প্রত্যাশা করো তাদের প্রতি তুমিও সেরুপ আচরণ করবে; কারণ এমনটিই নবীদের আইন"(ম্যাথিও ৭:১২)।
লেভিটিকাসে (১৯:১৮) বর্ণিত সেই বিখ্যাত উক্তি- "তোমার প্রতিবেশীকে ঠিক নিজের মতোই ভালবাসবে"- প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টজন্মের হাজার বছর আগেকার রচনা !

এর চেয়েও বড়ো কথা - গোল্ডেন রুল নিয়ে জুডিও-খৃষ্টানদের মাতামাতি অর্থহীন, কারণ এটি ছোট্ট কোন মরুচারী সম্প্রদায়ের একক সম্পত্তি নয়। নীচের রেফারেন্সগুলি পরখ করে দেখুন-

- দ্য ডকট্রিন অব দ্য মীন ১৩ (The Doctrine of the Mean 13)। যীশুর জন্মের ৫০০ বছর পুর্বে কনফুসিয়াস বলে গেছেন- "অন্যের কাছ থেকে যে আচরণ তুমি প্রত্যাশা করো না, অন্যের প্রতি সে আচরণ তুমি নিজে করো না"। (What you do not want others to do to you, do not do to others)।
- ইসোক্র্যাট্স্ (৩৭৫ খৃঃপুঃ)- "অন্যের যে কাজে তোমার মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক করে, অন্যের প্রতি তুমি সেরুপ কাজ কখনও করো না"।
- মহাভারতের শিক্ষা (১৫০ খৃঃপুঃ)- "সকল ন্যায়পরণতার নির্য্যাস হচ্ছেঃ অন্যের প্রতি সেই আচরণ করো যে আচরণ তুমি অন্যের কাছ থেকে প্রত্যাশা করো।

মাউন্টের ভাষণের দিন শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যীশু বলেছিলেন-
'Do not resist one who is evil. But if any one strikes you on the right cheek, turn to him the other also'- 'মন্দলোকের সাথে প্রতিরোধের পথে যেয়ো না। বরং কেউ যদি তোমার ডান চিবুকে আঘাত করে, অপর চিবুকটিও বাড়িয়ে দিও' (ম্যাথিও ৫:৩৯ আরএসভি)।

যীশু আরও বলে গেছেন-
'তোমরা শুনেছ- বলা হয়ে থাকে যে "তোমরা প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করবে"। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি- শত্রুকে ভালোবাসবে, যে তোমাকে যন্ত্রনা দেয় তার জন্যে প্রার্থনা করবে' (ম্যাথিও ৫:৪৩-৪৪, আরএসভি)।

উপরের নীতিবাক্যগুলি কেবলমাত্র খৃষ্টানদের একচেটিয়া বলে মনে করা হয়ে থাকে। তবে অনুরূপ সেন্টিমেন্ট অন্যান্য অখৃষ্টান সমাজেও প্রচলিত আছে– এই হয়েছে মুশকিল।

- যারা মঙ্গালাচরণ করে তাদের সাথে আমি মিশি, যারা মঙ্গালাচরণ করে না তাদের সাথেও আমি মিশি। এভাবেই মঙ্গাল অর্জিত হয়। যারা সৎ তাদের সাথে আমি সদাচারণ করি, যারা অসৎ তাদের সাথেও আমি সদাচারণ করি। এভাবেই সততা অর্জিত হয়।
  ---তাও ধর্ম। তাও চে চিং ৪৯।
- ক্রোধকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করো। অমঙ্গালকে মঙ্গাল দিয়ে জয় করো। ....মিথ্যাকে সত্য দিয়ে জয় করো।
  ---বৌদ্ধ ধর্ম। ধর্মপদ ২২৩।
- যে মহৎ সে কখনও মন্দ দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করে না; এ এমন এক সাধারণ নীতি যা প্রতিটি ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিৎ; পুণ্যবানের গহনা হচ্ছে তার আচরণ। একজন ব্যক্তি– হোক সে দুষ্টপ্রকৃতির, কিংবা সদাচারী, কিংবা মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধী– তার ক্ষতি করা কখনই উচিৎ নয়। মহৎ প্রাণের যিনি অধিকারী, তিনি কখনও অকরুণ হতে পারেন না; তিনি এমনকি সেই দুরাচারের প্রতিও করুণা প্রদর্শন করেন– অপরের ক্ষতিতেই যে খুশী. নিষ্ঠুর কাজেই যার আনন্দ। এমন কে আছে যে যার মধ্যে দোষ নেই?
  ---মহাভারত, যুদ্ধ কান্ড ১১৫।

প্রকৃতপক্ষে নিউ টেষ্টামেন্টের কোথাও উল্লেখ্যযোগ্য তেমন কোন নৈতিক ধারণার সন্ধান মেলে না যা মৌলিক। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইতিহাসবিদ এবং পাদ্রী জোসেফ ম্যাকাবেথ যথার্থই বলেছেন: 'এমনসব ভাবাদর্শ যীশুখৃষ্টের উপর আরোপ করা হয় .... যেগুলি পুর্ব হতেই ওল্ড টেষ্টামেন্টে ছিল। যীশুর আবির্ভাবের বহু পুর্ব হতেই এসব নীতি ইহুদি গোত্রগুলিতে প্রচলিত ছিল, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা –যেমন মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, পারসিক, গ্রীক, হিন্দু ইত্যাদি সভ্যতায়ও এসব ভাবাদর্শ প্রচলিত ছিল'।

বাইবেলের মতো কোরাণেও অনেক নীতিকথা রয়েছে যা প্রশংসাযোগ্য। এসবের মধ্যে রয়েছে পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণ করা, অসহায় পিতৃমাতৃহীনের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করা, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ না খাওয়া, দরিদ্রকে সাহায্য করা, নেহায়েত প্রয়োজন ব্যতিরেকে শিশু হত্যা না করা ইত্যাদি। এগুলি অবশ্যই নৈতিক কাজ, তবে আবারও বলতে হয় এর একটাও ইসলামের মৌলিক অবদান নয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির শাস্ত্রবাক্য ও অনুশাসনে আমরা কমন কিছু আদর্শ দেখতে পাই যা যুগে যুগে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এসব আদর্শ ও মুল্যবোধ সমাজবিবর্তনের সাথে সাথে জন্মলাভ করেছে। মানুষ যতোই সভ্য হয়েছে, তার মাঝে র‍্যাশনাল চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটেছে এবং কী করে আরও ভালোভাবে শৃঙ্খলার সাথে সামষ্টিক জীবন যাপন করা যায় তার উপায় হিসেবে এসব মুল্যবোধ সমাজজীবনে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে যেমন দাবী করা হয় যে মুল্যবোধ তথা আদর্শ স্বর্গ হতে নাজেল হয়েছে– স্বাক্ষ্যপ্রমানে তার সত্যতা মেলে না। স্বাক্ষ্যপ্রমান বরং স্বর্গের বাইরের কোন সোর্সকেই নির্দেশ করে।

নৈতিক আচরণ (Obsrving Moral Behavior)

মরালিটি বা নৈতিকতার উপর আলোচনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন বিবেচনা করা হয়েছে এমনটি খুব কমই দেখা যায়। মানুষের আচরণ– তা সে ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে হোক কিংবা সামাজিক পর্য্যায়ে হোক– পর্য্যবেক্ষন করলে অনেকগুলি গুরুত্বপুর্ণ উপাত্ত সামনে চলে আসে। নৈতিকতা ও মুল্যবোধের উপর বৈজ্ঞানিক ষ্টাডি পরিচালনা করতে গেলে পর্য্যবেক্ষনজাত এসব উপাত্তসমুহকে ভিত্তি হিসেবে গননা করতে হবে। আমরা এখন মানব প্রজাতির এমন কিছু আচরণ নিয়ে আলোচনা করবো প্রতিনিয়তই যা আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই।

মানবজাতির অধিকাংশ সদস্যের মধ্যেই সাধারণ কিছু নৈতিক আচরণ প্রতক্ষ করা যায়, ব্যক্তিভেদে এর পরিমান কিছু কমবেশী হয়ে থাকে। যদিও আমরা বিধিবদ্ধ আইন শাসিত সমাজে বাস করি, তথাপি আমাদের অধিকাংশ আচরণই স্বতঃস্ফূর্ত, আইনের প্রতি চোখ রেখেই আমরা এমন আচরণ করি তা কিন্তু নয়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়- দৈনন্দিন জীবনে আমরা অহরহই এমন অবস্থার সন্মুখীন হই যেখানে আমরা অতি সহজেই কাউকে প্রতারিত করতে পারি কিংবা কারও জিনিস চুরি করতে পারি। ধরা পড়ে শাস্তিভোগ করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকলেও আমরা তা করি না। দৈনন্দিন জীবনে আমরা গোল্ডেন রুল অক্ষরে অক্ষরে পালন করি না, তবুও কারও ক্ষতি হোক এমন কাজ সাধারনতঃ আমরা করি না। যদি আমরা দেখি যে একজন মানুষ কিংবা একটি ইতর প্রাণী কষ্ট পাচ্ছে, আমরা কষ্ট অনুভব করি, অনেক সময় তার কষ্ট লাঘব করার সাধ্যমতো চেষ্টাও করে থাকি। রাস্তায় দুর্ঘটনা দেখলে আমরা গাড়ি থামাই, দুর্ঘটনাকবলিতদের সাহায্যে এগিয়ে যাই। কোন ক্রাইম ঘটতে দেখলে আমরা পুলিশকে খবর দিতে ছুটি। আমরা শিশুদের স্নেহ করি, বয়স্ক পিতামাতার যত্ন নেই, দুর্ভাগাদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করি। আমরা স্বতঃপ্রনোদিতভাবে অনেক ঝুকিপুর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করি, দেশ ও কমুনিটির সুরক্ষার জন্যে সৈনিক হই, পুলিশ হই।

ধমীয় অনুশাসনের নির্দেশের জন্যেই আমরা এমন নৈতিক আচরণ করি বলে কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন। **কিন্তু যারা প্রচলিত কোন ধর্মই পালন করেন না, তারা যে সম্পুর্ণ বিপরীত আচরণ করে থাকেন তারও তো কোন প্রমান নেই**। তারাও তো সেই একই ধরণের মরাল প্রিন্সিপল দ্বারা তাড়িত হয়ে একইরুপ আচরণ করে থাকেন! অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোক একসেট কমন মরাল প্রিন্সিপল বা সাধারণ নীতি দ্বারা পরিচালিত হন যা ধর্মনির্ভর নয়।
একথা সত্য -এই 'কমন সেট অব মরাল প্রিন্সিপল' বলতে সবগুলি মরাল প্রিন্সিপলকে বুঝায় না। কোন একটি নৈতিক ইস্যুতে সকলেই যে একই মত পোষণ করবেন তাও নয়। একই ধমীয় গোষ্ঠির সদস্যরাও কোন বিষয়ে প্রচন্ডভাবে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন জন একই শাস্ত্রীয় নির্দেশের বিভিন্নরুপ ব্যখ্যা দিয়ে নিজের নিজের মতকে জাষ্টিফাই করার চেষ্টা করেন।

উদাহরণস্বরুপ খৃষ্টান কমুনিটির কথা বিবেচনা করা যাক। হত্যা-ইস্যুতে বাইবেলের নির্দেশের সম্পুর্ণ বিপরীতধমী ব্যখ্যা প্রদান করেন বিভিন্ন গোষ্ঠি। ক্যাথলিক এবং গোড়া খৃষ্টানরা ভ্রুণহত্যা, মরন্নাপন্ন রোগীর উপর হতে লাইফ সাপোর্ট যন্ত্রপাতি প্রত্যাহার, ষ্টেম সেল রিসার্স ইত্যাদি কাজকে ধমীয়ভাবে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতি এবং এসব কাজের জন্যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট প্রদান করার পক্ষপাতি। তাদের যুক্তির স্বপক্ষে তারা বাইবেলে বর্ণিত দাতের বদলে দাত, চোখের বদলে চোখ- এই দৃষ্টান্ত পেশ করেন। পক্ষান্তরে লিবারেল খৃষ্টানরা উপরোক্ত কাজের জন্যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট প্রদানে রাজী নন, তারা উপরোক্ত কাজগুলিকে নিষিদ্ধ করারও পক্ষপাতি নন।
এ প্রসঙ্গে দার্শনিক থিওডোর শিকের মন্তব্য- ভ্রুণহত্যা বিতর্কের উভয় পক্ষই বিশ্বাস করে যে নরহত্যা অনৈতিক। যে ক্ষেত্রটিতে তাদের মতানৈক্য- তা হচ্ছে মানব-ভ্রুনের প্রকৃতি। মানবভ্রুণকে (fetus) কি একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ অস্তিত্ব হিসেবে গন্য করা যায় যা নষ্ট করলে হত্যা করার মতো অনৈতিক কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে? এক কথায় বলা যায়- নৈতিকতা নিয়ে এই মতদ্বৈধতা কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সেজন্যে নয়, এই মতদ্বৈধতা রূঢ় বাস্তবতার একটি দিক নিয়ে।
কাকে হত্যা করা যাবে আর কাকে যাবে না- বাইবেলে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। একটি ভ্রুণ বা একগুচ্ছ ষ্টেম সেলকে হত্যা করতে বাইবেল পারমিশনও দেয়নি, নিষেধও করেনি। তবে শত্রুকে হত্যা করতে সে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে, বিশেষ করে যারা ইয়াহুর (Yahweh) পুজো করে না তাদেরকে।

ভালো সমাজ (The Good Society)

ইউরোপ বহুশতাব্দি ধরে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে। শুধু ইউরোপ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য ভুখন্ডের অবস্থাও কমবেশী একইরুপ ছিল। এইসব শাসকদের জীবনযাত্রা ছিল চরম অমিতব্যয়ী ও ভোগবিলাসপুর্ণ। পক্ষান্তরে প্রজাদের অবস্থান ছিল দারিদ্রের প্রান্তসীমায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ছিল শাসকের স্বেচ্ছাচারের অধীন। শাসকটি যতোই নিষ্ঠুর আর অযোগ্য হোন না কেন, রাজা হওয়ার স্বগীয় অধিকার রয়েছে বলে দাবী করতেন তিনি। ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে তিনি কীভাবে রাজসিংসাহনে আসীন থাকতে পারেন? একইভাবে ইসলামী জগতেও স্বেচ্ছাচারী শাসকরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে অপ্রতিহত শাসন পরিচালনা করে এসেছে বহু শতাব্দি।

ইসলাম ও খৃষ্টান জগতের ইতিহাস বহুশত বছরব্যপী প্রভুত্ববাদী অপশাসকদের শাসনের ইতিহাস; ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি এতটুকু ভ্রুক্ষেপ ছিল না এসব শাসকদের। 'এনলাইটেনমেন্ট' বা নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে সমাজে যখন 'রিজন' বা যুক্তির প্রাধান্য শক্তিশালী হয়, তখন থেকে এসব অপশাসকদের ক্ষমতা লোপ পেতে থাকে।

আধুনিক আমেরিকায় একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে খৃষ্টীয় মতাদর্শকে ধারণ করে আমেরিকান জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার সংবিধানের কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার ঘোষণপত্রে (ডিক্লারেশন অব ইন্ডেপেন্ডেন্স) 'সৃষ্টিকর্তা' শব্দটি আছে সত্য, তবে এই সৃষ্টিকর্তা খৃষ্টানদের গড নয়। তিনি টমাস জেফারসনের গড, এনলাইটেনমেন্টের গড। প্রাথমিক কালের প্রেসিডেন্টদের মধ্যে অধিকাংশই খুব একটা ভালো খৃষ্টান ছিলেন না। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং ন্যায়বিচারের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের উৎস্য ছিল এনলাইটেনমেন্ট ফিলসফি, বাইবেলের পৌরানিক বাণীসমুহ নয়।
আধুনিক গণতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা যেসব নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত, বাইবেলের কোথাও আপনি সেগুলি খুজে পাবেন না। উদাহরণস্বরুপ, বাইবেল-স্বীকৃত দাসপ্রথা এরুপ একটি বিষয় যা আধুনিক মুক্ত সমাজের সাথে পুরোপুরি সঙ্গাতিবিহীন। ওল্ড টেষ্টামেন্ট শুধু যে দাসপ্রথাকে স্বীকৃতিই দেয় তা নয়, কীভাবে আপনি এই প্রথাকে দৈনন্দিন জীবনে হ্যান্ডল করবেন তার নিয়ম কানুনও পাবেন সেখানে।

'তুমি যখন একজন হিব্রু দাস ক্রয় করবে, সে তোমাকে ছয় বছর সেবা করবে। অতঃপর সপ্তম বর্ষে সে মুক্ত হয়ে যাবে, এর জন্যে তাকে কোন দাম পরিশোধ করতে হবে না' (এক্সোডাস ২১-২)।

'যদি তার প্রভু তার জন্যে একটি স্ত্রী বরাদ্দ করে এবং সে (স্ত্রী) ছেলে অথবা মেয়ে প্রসব করে, তবে সেই স্ত্রী এবং তার সন্তানাদির মালিক হবে প্রভু এবং তাকে (দাসকে) একা একাই চলে যেতে হবে। (এক্সোডাস ২১-৪)।

দাসপ্রথা বিলুপ্তিতে অবদান রাখার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন যীশু। কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। দাসপ্রথার স্বীকৃতিসুচক সেইন্ট পলের ভাষ্য:
'দাসেদের প্রতি নির্দেশ, তারা স্ব স্ব প্রভুর অনুগত হোক এবং সর্বপ্রযত্নে তার সন্তুষ্টি বিধান করুক'। (টাইটাস ২:৯)।

উনিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রে যখন দাসপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন তুঙ্গে, তখন এই কুপ্রথা বহাল রাখার পক্ষে বহুলভাবে বাইবেলের দোহাই দেয়া হয়েছিল। ব্যাপ্টিষ্ট নেতা এবং প্রখ্যাত দাসমালিক রিচার্ড ফারম্যান (মৃ:-১৮২৫) দাসপ্রথার স্বপক্ষে বাইবেলীয় যুক্তিগুলি সন্নিবদ্ধ করেন যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকার বিখ্যাত গৃহযুদ্ধের সুচনা হয়। ক্যারোলিনা রাজ্যের ব্যাপ্টিষ্ট কনভেনশনের প্রেসিডেন্ট

হিসেবে ফারম্যান দক্ষিন ক্যারোলিনার গভর্নরকে লিখেছিলেন- "দাস রাখার অধিকার পবিত্র গ্রন্থগুলিতে সুস্পষ্টরুপে প্রতিষ্ঠিত, অনুশাসন ও উদাহরণ উভয়ভাবে"। দক্ষিন ক্যারোলিনার গ্রীনভিলে ১৮২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটিটির নামকরণ করা হয় রিচার্ড ফারম্যানের নামে- 'ফারম্যান ইউনিভার্সিটি'। উক্ত ইউনিভার্সিটির আর্কাইভে ফারম্যানের লেখা রক্ষিত আছে।

কনফেডারেসির প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিস দাবী করেছিলেন - শাস্ত্রনির্দেশের বাইরে তিনি কিছুই করেননি। তিনি বলেছিলেন- "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডিক্রিবলে দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠিত। উভয় টেষ্টামেন্ট -, জেনেসিস থেকে রিভিলেশন-, সব শাস্ত্রেই দাসপ্রথার স্বীকৃতি রয়েছে"।

মহামান্য পোপসহ ক্যাথলিক চার্চের সকল ধর্মযাজকই দাসদাসী রাখতেন, এমনকি উনিশ শতকেও। মেরিল্যান্ডের জেসুইট পাদ্রীরা, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার নানেরা দাস রাখতেন। ১৮৮৮ সালের পুর্ব পর্য্যন্ত চার্চ এই অমানবিক প্রথার নিন্দা করে কোন অফিসিয়াল বিবৃতি দেয়নি, প্রতিটি খৃষ্টান রাষ্ট্রে যখন উক্ত প্রথার বিলুপ্তি ঘটে, তার পরেই কেবল উক্ত সালে চার্চের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে। প্রখ্যাত ক্যাথলিক স্কলার জন টি নোনান জুনিয়রের মতে - চার্চ যীশু ও অন্যান্য নবীদের নৈতিক শিক্ষার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন এনেছে একথা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেন- দাসপ্রথা ও অন্যান্য উদাহরণের মাধ্যমে এটা প্রমানিত যে সময়ের সাথে সাথে চার্চের শিক্ষার পরিবর্তন ঘটে।

এখন কথা হলো, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অন্যত্র দাসপ্রথা বিলুপ্তির যে ক্যাম্পেইন শুরু হয় তার নেতৃত্বে ছিল খৃষ্টানরা। যেসব খৃষ্টান এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করে, তারা নিশ্চয়ই তাদের ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশগুলিকে অনুসরণ করতে যায়নি, বরং অনুসরণ করেছিল অন্তর্নিহিত মহত্তর কোন নির্দেশকে, অনুভব করেছিল এক innate sense of higher good এর প্রেরণা। এতে কি প্রমানিত হয় না মানুষের ভ্যালুজ (মুল্যবোধ) কোন শাস্ত্রীয় ঈশ্বর থেকে উদ্ভুত নয়?

সর্বশেষে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো নারীনির্য্যাতন নিয়ে, ইতিহাসের প্রতি বাকে অন্তহীন নির্য্যাতনের শিকার মানব প্রজাতির এই গুরুত্বপুর্ণ অংশটি। সেইন্ট পল বলে গেছেন:
'বধুগণ, তোমরা স্বামীর প্রতি অনুগত হও, যেভাবে তোমরা পরম প্রভুর আনুগত্য করো। কারণ স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর প্রভু, ঠিক যেভাবে যীশু চার্চের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা'।

স্ত্রীজাতিকে মানবেতর প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করার মধ্যে যে বিবেকহীনতা ও অন্যায় লুক্কায়িত রয়েছে, তা অবশেষে অনুভব করতে শুরু করেছে পশ্চিমা সমাজ। ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে ধর্মীয় অনুশাসনের পথ ধরে বিবর্তিত হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা ধর্মীয় অনুশাসনের বিপ্রতীপ পথে বিবর্তিত হয়, এটি তার সাম্প্রতিকতম প্রমান।

ইনার সোর্সঃ
বর্তমানে অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদই স্বীকার করেন যে বাইবেল এবং কোরাণের প্রতিটি বাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে এমন নয়। তারা একথাও স্বীকার করে নিয়েছেন যে গ্রন্থগুলিতে অনেক বিষয় রয়েছে যা যুগের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ নয়। তবে তারা বলেন- গ্রন্থগুলিতে অনেক কিছু শেখারও আছে। আমি তাদের কথার দ্বিমত করবো না। এ লেখায় ইচ্ছে করেই আমি বেশ কিছু কুখ্যাত (notorious) আয়াতের উল্লেখ করেছি, তবে আমি নিজে সেগুলো তৈরী করিনি। আরও বহু অনুরুপ আয়াতের সাথে কাগজে কলমে রেকর্ড হয়ে আছে সেগুলি, যে কেউ ইচ্ছে করলেই তা নিজে নিজেই পাঠ করতে পারেন। আমি শুধু এটিই প্রমান করতে চেয়েছি যে সমাজের সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিটিও কীভাবে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বাইরে জীবনযাপন করছেন এবং প্ররম প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করছেন।

এটা অবিসংবাদিতভাবে প্রমানিত যে ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশ লোক শাস্ত্রবিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে না ; কোনটি ভাল কোনটি মন্দ তা তারা নিজেদের বিবেক দিয়ে ঠিক করে নেয় এবং তদানুযায়ী কাজ করে থাকে। ঈশ্বরের নির্দেশের নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে আজকাল আর কোন ইহুদি-খৃষ্টানকে দেখা যায় না। মুসলমানদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যক লোককেই এই পথ অবলম্বন করতে দেখা যায়। হাতে গোণা গুটিকয়েক চরমপন্থী বাদে সংখ্যাগরিষ্ট ধর্মীয় নেতা এসব জঘন্য কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে বক্তব্য দিচ্ছেন এখন। এসব ধর্মীয় নেতা এবং তাদের অনুসারীরা এক্ষেত্রে শাস্ত্র নির্দেশের পরিবর্তে বরং নিজেদের অন্তর্নিহিত বিবেক-প্রনোদিত নৈতিকতাকেই উর্ধে তুলে ধরেন- অনেক ক্ষেত্রেই যা শাস্ত্রবিধানের সরাসরি পরিপন্থী।

মোদ্দা কথা হলো- কোন্ কাজটি নৈতিক আর কোনটি অনৈতিক ধর্মপ্রাণ লোকেদের অধিকাংশই তা নিজের বিবেক অনুযায়ী ঠিক করে নেয়। অথচ সেই একই কাজ যখন কোন নাস্তিক কিংবা হিউম্যানিষ্ট করে- ধর্মানুরাগীরা তাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। তার বিরুদ্ধে 'মরাল রিলেটিভিজম' অথবা 'মরাল সাবজেক্টিভিজম' এর অপবাদ আরোপ করে। বলে- নাস্তিকের আবার নৈতিকতা- 'নাস্তিকশাস্ত্রে সবই বৈধ'। মরাল রিলেটিভিজম হচ্ছে - একটিমাত্র মাপকাঠির উপর নির্ভর করে সব জিনিষের ভালোমন্দ নির্ধারণ না করে বরং প্রতিটি ইনডিভিজুয়াল ঘটনার আলোকে নৈতিকতার সঠিক এবং উপযুক্ত মানদণ্ডটি নির্ধারণ করা। তাই বলে হিউম্যানিষ্টরা খেয়ালখুশীমতো নৈতিকতার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে তা কিন্তু নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন হিউম্যানিষ্ট ও একজন ধর্মবিশ্বাসীর নৈতিক আচরণে কোন মৌলিক প্রভেদ দেখা যায় না। সাবজেক্টিভিজমের অর্থ হচ্ছে- প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে এক সেট করে মরাল গাইডেন্স। বিশ্বাসীরা যেমন সাবজেক্টিভিজম অনুসরণ করে না, হিউম্যানিষ্টরাও তাই। ভালোমন্দের স্বরূপ নির্ণায়ক মৌলিক ধারণা প্রায় সব সমাজেই এক । নৃতত্ত্ববিদ সলোমন এ্যাশ যথার্থই বলেছেন- "মানব সমাজে কখনও রিলেটিভিজমের চর্চা হয়েছে- এর স্বপক্ষে কোন নৃতাত্ত্বিক প্রমান নেই । আমরা এমন কোন সমাজের কথা জানি না যেখানে সাহসিকতাকে ঘৃনা করা হয় এবং কাপুরুষতাকে সম্মানের চোখে দেখা হয়, যেখানে উদারতা পাপ বলে গন্য হয় এবং অকৃতজ্ঞতা পুন্য বলে গন্য হয়"। আজকালকার যুগে কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে যুদ্ধে আটককৃত বন্দীদের মধ্য হতে কুমারীদের বাছাই করে নিজেদের লালসা পরিতৃপ্তির জন্যে রেখে দিয়ে বাদবাকী সব্বাইকে পাইকারীভাবে হত্যা করে ফেলা নৈতিক কাজ?

বাইবেলোক্ত ঈশ্বর এবং তার প্রধান প্রধান প্রেরিত পুরুষেরা যেসব নৃশংসতা প্রদর্শন করে গেছেন, বর্তমান যুগের অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসী সেগুলিকে শুধু যে প্রত্যাখ্যানই করে তা নয়, সেই সংগে অনেক নির্দোষ নির্দেশকেও অস্বীকার করে তারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যীশু খৃষ্টানদেরকে নির্জনে প্রার্থনা করতে অনুপ্রানিত করে গেছেন, কিন্তু কয়জন খৃষ্টান যীশুর সেই নির্দেশটি পালন করে থাকে- "এবং তোমরা যখন প্রার্থনা করবে, অবশ্যই মোনাফেকদের মতো করবে না। কারণ তারা সিনাগগ ও রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে (প্রকাশ্যে) প্রার্থনা করতে ভালবাসে, এমনভাবে যেন লোকেরা দেখতে পায়। বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের বলছি- তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যখন প্রার্থনা করবে, ঘরের ভেতর যাও, দরজা বন্ধ করো এবং সেই পিতার কাছে প্রার্থনা করো যিনি গুপ্ত। এবং তোমাদের পিতা- যিনি গোপন জিনিসও দেখতে পান- অবশ্যই তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন" (ম্যাথিও-৬ঃ৫-৬, আরএসভি)।

যীশুর এই সুস্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করে খৃষ্টানরা সর্বত্রই বিরাট বিরাট পাবলিক শো'র মাধ্যমে এমনভাবে প্রার্থনা করে থাকে যেন তাদের ধর্মশীলতা জনসমক্ষে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। সুপরিসর চার্চ, রাজনৈতিক সমাবেশ কিংবা স্কুলের ফ্ল্যাগের নীচে দাড়িয়ে সমবেতভাবে প্রার্থনাবাক্য আওড়ায় তারা। দেশের আদালত প্রকাশ্য প্রার্থনা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা দিলে আদালতের উপরও খেঁপে যায়

তারা। তাদের এই আচরণ স্পষ্টতই যীশুর নির্দেশের পরিপন্থী, সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে অবশ্যই নৈতিকতা বিরোধী। এই আচরণকে কীভাবে জাষ্টিফাই করবে ধর্মবিশ্বাসীরা? এই কাজের জাষ্টিফিকেশনের জন্যে অবশেষে বিবেক-তাড়িত নৈতিকতারই শরণ নিতে হবে তাদের, বলতে হবে- যীশু যাই বলুন, খোলা জায়গায় প্রার্থনা করার মধ্যে তেমন খারাপ কিছু নেই !

এবং কয়জন খৃষ্টান (তা তারা যে দলেই থাকুক না কেন) আছে যারা প্রভুর সেই মহান নির্দেশ- "লাভ ইউর এনিমি"- অনুসরণ করে হিটলার কিংবা ওসামা বিন লাদেনকে ভালবাসতে যাবে? আর যাবেই বা কেন?

মোট কথা হলো, অভিজ্ঞতালব্দ ঘটনাবলী প্রমান করে যে মানুষ এক ধরণের নৈতিক জীব ছাড়া আর কিছুই নয়; তাদের ভালোমন্দ সংক্রান্ত নৈতিক বোধ অনেক ক্ষেত্রেই মহান একেশ্বরবাদী ধর্মসমুহের নৈতিক শিক্ষার পরিপন্থী। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে মানবমনে বিরাজমান নৈতিকতা-বোধের শিকড়টির মুল ধর্মের মধ্যে প্রোথিত নয়, এর উৎপত্তিস্থল অন্য কোথাও।

অভিজ্ঞতালব্দ নৈতিকতা (Empirical Morality)

যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোন ঐশ্বরিক নির্দেশের ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মুল্যবোধের জন্ম হয়নি, তাহলে প্রশ্ন- কোথা থেকে জন্ম নিল এই গুন? প্রকৃতপক্ষে মুল্যবোধের অরিজিন যে ঐশ্বরিক নয়- একান্তভাবেই প্রাকৃতিক (বায়োলজিক্যাল অরিজিন, কালচারাল অরিজিন এবং ইভোলিউশনারি অরিজিন), যথেষ্ট প্রমান রয়েছে তার। ডারউইন প্রজাতিসমুহে সহযোগীতা ও পরার্থবাদীতার উপকারীতা দেখতে পেয়েছিলেন। আধুনিক চিন্তাবিদগণ আরও নিবিড়ভাবে এই পর্য্যবেক্ষনের উপর কাজ করেছেন এবং দেখিয়েছেন- কীভাবে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথ বেয়ে নৈতিকতাবোধ ক্রমান্বয়ে আমাদের মাঝে ধাপে ধাপে জন্মলাভ করেছে।
এমনকি নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও কিছু কিছু নৈতিক আচরণ বা এর চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ভ্যাম্পায়ার বাদুরেরা নিজেদের মধ্যে খাবার ভাগাভাগি করে খায়। বানরেরা দলবদ্ধভাবে খাদ্যান্বেষণ করে; দলের মধ্যে কোন বানর উত্তেজিত হয়ে পড়লে অন্য সদস্যরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। ডলফিনদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য ডলফিনরা তাকে উচু করে তুলে ধরে যেন রোগাক্রান্ত সাথীটি সহজে শ্বাস টানতে পারে। তিমিদের মধ্যে কেউ আহত হলে অন্যান্য সদস্যরা নিজেদের সমুহ ক্ষতির রিস্ক নিয়েও আহত সংগীর সাহায্যে এগিয়ে আসে। হাতি পরিবারে আহত সদস্যকে রক্ষা করতে পরিবারের অন্য সদস্যরা এগিয়ে আসে।
উপরের উদাহরণগুলি নৈতিকতার একেবারে প্রাথমিক দৃশ্যপট। এই আদিম বোধই মানুষের শারিরিক ও কালচারাল বিবর্তনের পথ বেয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এই সেই সোর্স -যেখান থেকে মানুষ ভালোমন্দ ন্যায়অন্যায় বোধগুলি লাভ করেছে।
এ বিষয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক।
----সমাপ্ত---